শিক্ষক পরিচয়

শিক্ষক= শি-শিষ্ঠাচার, ক্ষ-ক্ষমাশীল, ক-কর্তব্যপরায়ণ। এর আরবি হলো মুআল্লিম। ইংরেজি হলো- Teacher। Teacher= T- Truthdul (সত্যবাদী), E- Educated (শিক্ষিত), A-Active (সক্রিয়),

C- Character (চরিত্রবান), H-Honest (সৎ), E-Energetic (উদ্যোগী), R-Responsible (দায়িত্ববান)

পরিভাষায় শিক্ষাদানের মহান ব্রত যার কাজ তাকেই শিক্ষক বলা হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিতদেরই শিক্ষক বলা হয়। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার কাজে যারা আছেন তাদেরকে শিক্ষক বলা হয় আর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধ্যাপক বলা হয়ে থাকে। শিক্ষকদের জাতি গঠনের কারিগর বলা হয়। কেননা একজন আদর্শ শিক্ষকই পারেন তার অনুসারীদের জ্ঞান ও ন্যায় দীক্ষা দিতে। শিক্ষার্থীর মানবতাবোধ কে জাগ্রত করে একজন শিক্ষক কেবল পাঠদানকে সার্থকই করে তোলেন না, পাশাপাশি দেশের উন্নয়নকে ত্বরাণ্বিত করেন। স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করে তাদেরকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন।

একজন সফল শিক্ষকের গুণাবলি

একজন আদর্শ শিক্ষকই জাতির মেধা গড়ার কারিগর। শিক্ষকের মেধাশ্রমই জাতির অমূল্য সম্পদ। তাই তাকে হতে হয় আর দশজন মানুষের তুলনায় সেরা। কেননা তাকে দেখেই শেখে আগামী প্রজন্ম। যদিও আদর্শ শিক্ষকের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেয়া কঠিন, তবে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তেমনই কিছু বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে নিজের মধ্যে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে এই লেখায়।

১. একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে

Todd Whitaker-এর লেখা 50 Ways to Improve Student Behaviour- এ তিনি বলেছেন, একজন শিক্ষকের আদর্শ শিক্ষক হয়ে ওঠার পেছনে অন্যতম বাধা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাঁর মতে:

I. অনেক শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে না যে তাদের শিক্ষকরা আসলে তাদের উপর বিশ্বাস করে।
II. অনেক শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে না যে তাদের বাবা-মা তাদের বিশ্বাস করে।
III. অনেক শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে না যে বড়রা তাদের বিশ্বাস করে।
IV. তাই অনেক শিক্ষার্থী নিজেরাই নিজেদের বিশ্বাস করে না।
V. যে শিক্ষার্থীরা নিজেদের নিজেরা বিশ্বাস করে না তাদের আচরণগত ও একাডেমিক সমস্যা বেশি থাকে।

শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে শিক্ষকের করণীয়:

I. নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য তৈরি করা- বছরের শুরুতেই যদি শিক্ষার্থীদের নিয়ে সারা বছরের জন্য একটি লক্ষ্য স্থির করা যায় তবে শিক্ষার্থীরা সুস্পষ্ট একটি ধারণা নিয়ে বছরটা শুরু করতে পারে। সঙ্গে তৈরি করতে হবে প্রতিটি ক্লাসে কী পড়ানো হবে সেটাও। নতুন একটি অধ্যায় বা বিষয় নিয়ে ক্লাস শুরুর সময় শিক্ষক যদি বলে, 'আজ তোমরা গুণনের প্রথম ধাপটি শিখবে' এবং ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'তোমাদের অভিনন্দন, এখন তোমরা তোমাদের মা-বাবাকে কীভাবে গুণতে শিখলে তা দেখাতে পারবে'! 'শিক্ষকের মতো তারাও যে কাউকে শেখাতে

পারে', এই দৃষ্টিভঙ্গিটি যদি তাদের মাঝে তৈরি করা যায় তবে তাদের নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, সঙ্গে শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা বাড়বে।

II. প্রতিনিয়ত আশ্বস্ত করা- শিক্ষার্থীর নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে তাকে প্রতিনিয়ত বলতে হবে, 'তোমার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, হাল ছেড়ো না, আমি তোমার পাশে আছি'। শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করা এবং উৎসাহিত করার মাধ্যমে তাদের দারুণভাবে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা যায়।

III. প্রযুক্তির ব্যবহার- শিক্ষাবিষয়ক প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণকে আরও আনন্দদায়ক ও কার্যকরী করে তুলতে পারে। এমনকি সবচেয়ে ভিতু ও ঘরকুনো স্বভাবের শিক্ষার্থীও নিজেকে খোলস থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসতে সহায়তা করে এই পদ্ধতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গণিত শেখার গেম। শিক্ষার্থীদের যখন বণ্যাকবোর্ডে গণিত শেখানো হয় তখন অনেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, তবে সেই একই কাজ যদি ভিডিও গেমের মাধ্যমে শেখানো যায় তবে তা শিক্ষার্থীদের কাছে মজাদার ও আনন্দদায়ক করে তুলবে। এতে করে পিছিয়ে পড়া বা ভিতু শিক্ষার্থী যারা রয়েছে তাদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

২. একজন আদর্শ শিক্ষক আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করেন

একজন শিক্ষক অনেক জ্ঞানী হতে পারে, ক্লাসে পাঠদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে এমনকি দুর্দান্ত বোঝানোর ক্ষমতাও তাঁর থাকতে পারে; কিন্তু আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করতে না পারলে সমস্ত অর্জনই তাঁর মাটি হয়ে যেতে পারে।

আকর্ষণীয় ও কার্যকর শ্রেণিকক্ষ গড়ে তুলতে শিক্ষকের করণীয়:

a. ক্লাসের নিয়মকানুনগুলো নির্ধারণ করা- একে অপরের প্রতি কীভাবে আচরণ করবে, নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকবে কীভাবে বা ক্লাসে কীভাবে অংশগ্রহণ করবে; এসব বিষয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি নিয়ম তৈরি করা যায়। যেমন-

১. শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব।
২. দলে কাজের সময় সবার মতামত শুনব।
৩. অন্যের মতের সাথে একমত না হলে ভদ্রভাবে যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব।
৪. দলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করব।
৫. কিছু বলার আগে হাত তুলব।
৬. সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব এবং সদ্ভাব বজায় রাখব।
৭. আমার খাতায় আমার কথা বা চিন্তা নিজেই লিখব।
৮. সবাই একসাথে কথা বলব না, একজন বলার পর অন্যজন বলব।
৯. সবাইকে দলের কাজ উপস্থাপন করার এবং অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেব।
১০. শান্তি বজায় রাখব যাতে সবাই সবার কথা শুনতে পায়।
১১. দলের কাজ পরিচালনায় একে অন্যকে সহযোগিতা করব ইত্যাদি।

সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে নিজেদের সেই নিয়মের প্রতি দায়বদ্ধ ভাবতে শুরু করবে। ফলে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে তারা শিক্ষক বা অন্য সহপাঠীদের উপর দ্বায় না চাপিয়ে নিজেদের দ্বাই করবে এবং নিজে নিজে তা সমাধানের চেষ্টা করবে।

b. শ্রেণিকক্ষে ক্যাপটেইন নির্বাচন করা- শ্রেণিকক্ষে ক্যাপটেন বা শ্রেণিনেতা নির্বাচন করার গুরুত্ব অনেক। তবে কয়েকদিন পর পর (হতে পারে প্রতি পনের দিন পর বা প্রতি মাসে) নতুন শ্রেণিনেতা নির্বাচন করা উচিত। নতুবা একজন বেশিদিন নেতৃত্ব দিলে তার মধ্যে অহমিকা এসে যেতে পারে। তাছাড়া অন্যরা নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। পালাক্রমে নেতৃত্ব দিলে সকল শিশুর মধ্যেই নেতৃত্বের গুণাবলি তথা আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হবে।

তাছাড়া, মাঝে মাঝে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বসার জায়গা পরিবর্তন করে বসানো, যেমন- সামনের বেঞ্চে যারা বসেছে তারা পেছনে এবং পেছনে যারা বসেছে তারা সামনে বসবে। পাঠের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়েও পাঠদান করানো যেতে পারে। শিক্ষক ক্লাসে যখন প্রশ্ন করবে তখন প্রশ্নটি উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে করতে হবে। অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষে একই রকম একাধিক সেট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষক যদি শিক্ষাদান কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনে ব্যর্থ হন অথবা উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করলেও যথার্থভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হন, তবে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সার্থক ও কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই শিক্ষক যদি পাঠদানের সকল পদ্ধতি বা কৌশল এবং প্রয়োগকৌশল খুব ভালোভাবে জেনে তা যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারে, তবেই শ্রেণিকক্ষকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব হবে।

৩. একজন আদর্শ শিক্ষক সবসময় প্রস্তুত থাকেন

সময় ব্যবস্থাপনা ও ক্লাস নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আসা একজন ভালো শিক্ষকের বড় গুণ।

কার্যকরী প্রস্তুতি অর্জনের জন্য শিক্ষকের করণীয়:

a. বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান- শিক্ষক যা পড়াবেন সে সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের প্রস্তুতির ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্তর হচ্ছে:

   ১. জ্ঞান- যা পড়াবেন তা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে।

   ২. স্বভাব- একজন শিক্ষক সুন্দর স্বভাবের অধিকারি হবে।

   ৩. ক্রিয়াকলাপ- শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে হবে। বইয়ের বাইরে থেকেও ব্যাখ্যা দিয়ে, বাস্তব বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে হবে।

b. Yale Center for Teaching and Learning-এর মতে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের যেসব বিষয়ে প্রস্তুতি থাকা উচিত:

১. পড়া এবং সমস্যা সেট করা।

২. প্রতি সপ্তাহের লেকচার নোট তৈরি করা ।

৩. ক্লাসের সময়কে সর্বোচ্চ কার্যকরী করে তুলতে পরিকল্পনা করা।

৪. ক্লাসে ব্যবহার করতে বা বোর্ডে লিখতে প্রশ্নের তালিকা তৈরি করা।

৫. শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসের জন্য হোমওয়ার্ক বা প্রশ্ন নকশা করা।

৬. ক্লাসের জন্য কুইজ তৈরি করা।

৭. শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ, সমস্যা বা আগ্রহের বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করা।

৮. বিতর্কের জন্য বিষয় নির্বাচন ও পর্যালোচনা করা।

৯. খবরের কাগজ বা অন্যান্য জায়গা থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া।

৪. একজন আদর্শ শিক্ষক সর্বদা নিয়মানুবর্তিতা বজার রাখেন

জীবনের সর্বস্তরে তথা সামাজিক, পারিবারিক কিংবা রাষ্ট্রীয়; সকল ক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তী হওয়া অত্যাবশ্যক। মানব জীবনে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে M. K. Gandhi বলেছেন,

Discipline maintains system,
System maintain development,
Development vibrates human-life,
So discipline must be followed.

অর্থ- নিয়মানুবর্তিতা সঠিক কর্মব্যবস্থা বজায় রাখে, সঠিক কর্মব্যবস্থা উন্নয়ন বজায় রাখে, উন্নয়ন মানবজীবনকে ফুলকিত রাখে; সুতরাং নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করা উচিত।

নিয়মানুবর্তিতা চর্চায় শিক্ষকের করণীয়:

a. নিয়ম-শৃঙ্খলা যথার্থরূপে পালন করে চলা- শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী শুধু বইয়ের পড়াই শেখে না; তাঁর আচার-ব্যবহার, কথা বলার ভঙ্গিসহ প্রায় সব কিছুই শিক্ষার্থীরা অনুসরণ-অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তাই একজন শিক্ষকের খুব সতর্কতার সঙ্গে নিয়ম- শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা উচিত।
b. অতিরঞ্জিত ও আড়ম্বরতা বিবর্জিত কঠোরতা- শিক্ষার্থীদের অবশ্যই শাসন করতে হবে; তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে সেই শাসন বা কঠোরতায় আড়ম্বরতা বা অতিরঞ্জিত কোনো আচরণ প্রকাশ না পায়।
c. শিক্ষার্থীদের ভুলের কারণে রোষান্বিত বা ঈর্ষান্বিত না হওয়া- শিক্ষার্থীদের ভুলের কারণে কোনোভাবেই রোষান্বিত বা ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়। তাহলে সেখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়।
d. শিক্ষার্থীদের মাঝে ন্যায়বিচার বজায় রাখা- মানবিকতা ও নৈতিকতা বজায় রাখতে শিক্ষার্থীদের মাঝে অবশ্যই ন্যায়বিচার বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিচারের ক্ষেত্রে কখনোই পক্ষপাতিত্ব করা উচিত হবে না।

৫. একজন আদর্শ শিক্ষক সর্বদা অভিভাবক, পরিবার এবং সমাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন

বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সমাজে একজন ইতিবাচক ব্যক্তি হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকা জরুরি। পিতা-মাতা, অভিভাবক, পরিবার কিংবা সমাজ; সব জায়গাতেই পেশাগত ও ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমেই একজন শিক্ষক সবার মাঝে আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন।

সুসম্পর্ক বজায় রাখতে শিক্ষকের করণীয়:

a. শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের প্রতি সম্মান এবং ভদ্রতা প্রদর্শন করার মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।
b. শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এবং উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়ার সময় অভিভাবকের মতামতকে বিবেচনায় রাখা, শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করা বা অভিভাবকদের অভিযোগকে আমলে নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।
c. শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের পরিবার এবং সমাজের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি।
d. শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ, অবস্থান কিংবা পরিবার থেকে এসে থাকে; কাজেই এ বিষয়টি শিক্ষকগণ অনুধাবন করবেন। শিক্ষার্থীদের পরিবার এবং সমাজের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক

পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকদের সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

যদিও আদর্শ শিক্ষকের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা বা মাপকাঠি নেই; তবু সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে শিক্ষকরা নিজেদের সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা অর্জন করতে পারেন অথবা নতুন শিক্ষকরা নিজেদের আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য নিতে পারেন। Jeffrey Glanz-এর গবেষণার উপর ভিত্তি করে তাঁর লেখা Teaching 101: Classroom Strategies for the Beginning Teacher-এ নতুন শিক্ষকদের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ৮টি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে একটি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করেছেন-

১. আপনি যে বিষয়বস্তু শেখাচ্ছেন তার উপর আপনার কি সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে?
২. আপনি কি শিক্ষাদান পদ্ধতি, শেখার পদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রম পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন?
৩. আপনি কি নিজেকে ভালোভাবে জানেন?
৪. আপনি কি অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন?
৫. আপনি কি বিচিত্র, চিন্তাভাবনামূলক প্রশ্ন করতে পছন্দ করেন?
৬. আপনি কি সবসময় নির্দেশনার কাজের পরিকল্পনা করেন?
৭. শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা এবং কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনি কি সফল?
৮. আপনি কি ভালো যোগাযোগকারী?

যদি আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তবে আপনি সঠিক পথেই আছেন, আর যদি 'না' হয় তবে চেষ্টা করুণ নিজেকে আরও দক্ষ করে তুলতে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে একজন শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য

১. আদর্শবান
২. ইসলামি জ্ঞানে গভীরতা থাকা
৩. ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন
৪. মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সম্পন্ন
৫. বিচক্ষণ
৬. প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক

মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

আপনি একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চান। তবে কে হবে আপনার আদর্শ। আপনার প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"অবশ্যই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের জীবনে সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আহযাব, আয়াত-২১)

আর তিনি যে, আমাদের জন্য শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন,

وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

"আমি তোমাদের জন্য শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ২২৯)

সুতরাং একজন মুসলিম শিক্ষক হিসেবে আমাদের অনুসর করতে হব, মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে, যিনি স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী।

নিম্নে রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. সাহাবীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান : মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণ রাসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর নিকট দীনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন এবং তিনি তাঁদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। একবার রাসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) তিনবার উচ্চারণ করলেন وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ -আলণ্ঢাহ্র কসম! সে মুমিন হবে না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলালণ্ঢাহ! সে ব্যক্তি কে? বললেন: যে ব্যক্তির অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। এভাবে তিনি দীনের বহু বিধি-বিধান, শরীআতের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জীবন-যুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে যে সকল সমস্যা ও জটিলতার মুখোমুখি হতেন সে ব্যাপারে ইসলামি শরীআতের আহকাম জানার জন্য রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) প্রশ্ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) শিক্ষার মজলিসে অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কথা বলতে বারণ করতেন।

২. নিজ থেকে প্রশ্ন করে উত্তর দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে দীনী বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন করার সাধারণ অনুমতি ছিল এবং তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এমনকি মাঝে মাঝে নিজে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) প্রশ্ন করে নিজেই জবাব দিতেন।

৩. শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনা : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) শিক্ষা মজলিস থেকে উঠে যাবার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) পরস্পর আলোচনা ও অনুশীলন করতেন। রাসূল (সা.) ও এমনটি করতে তাকিদ ও উৎসাহ দিতেন। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি শেষ পর্যায়ের মুহাজিরদের একটি দলের সাথে ছিলাম। একজন কারী আমাদেরকে কুরআন শোনাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.)-এসে জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কী করছো? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলালণ্ঢাহ! আমাদের একজন কারী কুরআন পড়াচ্ছিলেন এবং কিতাবুলণ্ঢাহ শুনছিলাম। তিনি বললেন, আলণ্ঢাহর শুকরিয়া, তিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকদের সৃষ্টি করেছেন যাদের সাথে আমার বসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা বলে তিনি আমাদের দলটির মধ্যে বসে পড়েন এবং আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।

৪. নিষিদ্ধ বস্তুকে সরাসরি নির্দেশ করে শিক্ষাদান : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) মাঝে মাঝে যে বস্তুটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন সেটি হাতে উঠিয়ে শ্রোতাদের সামনে উঁচু করে ধরতেন। মুখে নিষিদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি বস্তুটি বাস্ড়বেও দেখিয়ে দিতেন। এতে নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি শ্রোতাদের অন্তরে শক্তভাবে বসে যেত, সাথে সাথে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টও হয়ে যেত।

৫. কোন রকম প্রশ্ন ছাড়াই নিজেই কোন বিষয়ের জ্ঞান দান : বিশেষত- অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি এমনটি করতেন। অনেক সময় শ্রোতা বা সঙ্গীরা সে বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার ব্যাপারে মোটেও সচেতন থাকতেন না। তিনি তাঁর সঙ্গীদের অন্তরে কোন একটি বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তার জবাব দিয়ে দিতেন। যাতে তা অন্তরে উদয় হয়ে শক্ত ভীত গড়ে তুলতে না পারে এবং সে অনুযায়ী কোন কর্মও সম্পদান করে না ফেলতে পারে।

৬. প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জবাব দান : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) অনেক সময় প্রশ্নকারীর প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করে তার প্রসঙ্গ থেকে ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যেতেন। তিনি তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দ্বারা বুঝতে পারতেন যে, এই প্রশ্নের জবাব বোধগম্য হওয়ার যোগ্যতা প্রশ্নকারীর নেই। যেমন প্রশ্নকারী কিয়ামতের দিনক্ষণ জানতে চাইলে, তিনি ঘুরিয়ে কিয়ামতের প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা দেন,

কেননা কিয়ামতের সঠিক দিনক্ষণ কেবল মহান আলণ্ঢাহই জানেন। কিয়ামতের দিনক্ষণ জানার চেয়ে এর জন্য প্রস্তুতি নেয়া অধিক প্রয়োজন।

৭. প্রশ্নকারীর মুখ দ্বারা প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করিয়ে শ্রোতাদের শিক্ষাদান : প্রশ্নকারী হয়তো কোন বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করেছেন, রাসূল (সা.) তার জবাব দিয়েছেন। কিন্তু জবাবে সবকথা স্পষ্ট হয়নি। তাই তিনি প্রশ্নকারীর মুখ থেকে আবার প্রশ্নটি শুনতেন এবং পূর্বের জবাবের সাথে বিষয় সংশিণ্ঢষ্ট অতিরিক্ত জ্ঞানও দান করতেন।

৮. সাহাবীকে উত্তর দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষাদান : অনেক সময় এমন হতো যে, কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয় জানার জন্য রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করলো, কিন্তু তিনি নিজে জবাব না দিয়ে উপস্থিত কোন একজন সাহাবীকে তার জবাব দানের দায়িত্ব দিলেন। এর উদ্দেশ্য হলো, জবাব কিভাবে দিতে হয় সেই প্রশিক্ষণ দেয়া।

৯. অনুমোদন দিয়ে শিক্ষাদান : এটা সুন্নাহর একটি অন্যতম শ্রেণি। উছূল ও হাদিসবিদগণ এ জাতীয় সুন্নাহকে তাকরীরী সুন্নাহ বা হাদিস বলেছেন। তার ধরণ বা প্রকৃতি এ রকম যে, রাসূলুলণ্ঢাহর (সা.) সামনে কোন মুসলিম কোন কথা বা কাজ করতো, কিন্তু তিনি একেবারে চুপ থাকতেন, অথবা সেই কথা বা কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। মূলত এই চুপ থাকা অথবা সন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যমে সেই কথা বা কাজটির বৈধতা দান করেছেন।

১০. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনার সদ্ব্যবহার করা : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) হয়তো কোন বিষয় শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, তখন হয়তো আকস্মিকভাবে একটি বিষয় বা ঘটনার অবতারণা হলো যার সাথে ঐ শিক্ষণীয় বিষয়টির মিল আছে। তিনি সাথে সাথে এই দু'টির মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে বলতেন এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সেটির সদ্ব্যবহার করতেন। তাতে শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়টি অধিকতর বোধগম্য ও স্পষ্ট হতো। স্বাভাবিক কথা বা বক্তৃতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে এ পদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞান অধিকতর শক্ত ও দৃঢ় হয়।

১১. কসম বা শপথের মাধ্যমে জোর দিয়ে শিক্ষা দান : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) অনেক সময় কথার সূচনা করতেন আলণ্ঢাহর নামে কসম বা শপথের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য হতো তিনি যে বিষয়টি বলতে যাচ্ছেন তার গুরুত্ব বুঝানো এবং শ্রোতাকে তার প্রতি মনোযোগী করা।

১২. শিক্ষাদানে মধ্যপন্থা অবলম্বন : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁদের উপযুক্ত সময় ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে তাঁরা ক্লান্ত বা বিরক্ত না হন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা মধ্য ও পরিমিত পন্থা অবলম্বন করতেন। হাদীসের গ্রন্থসমূহে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

১৩. শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করার লক্ষ্যে পরীক্ষা : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন যা তিনি জানতেন। এর উদ্দেশ্য হতো তাদের মেধা, মনন ও জ্ঞানের পরীক্ষা এবং চিন্তা ও অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করা।

১৪. পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষাদান : রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি হলো সংলাপ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান। এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদেরকে সতর্ক করা, জবাবদানের জন্য তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং জবাব দানের জন্য চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। জবাবদানে অক্ষম হলেও বিষয়টি যাতে সহজবোধ্য হয় এবং অন্তরে বসে যায় তাই এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য।

১৫. শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষালয় স্থাপন : মহানবী (সা.) নবুওত লাভের পর প্রথমেই তাঁর আশেপাশে যে সকল সাহাবা আজমাইন (রা.)-গণ জড়ো হতে লাগলেন তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নিলেন। মক্কায় প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলেন হযরত আরকাম ইবনে

আবিল (রা.)-এর গৃহ। একারণেই ইসলামের প্রথম মাদরাসা হিসেবে অনেকে দারুল আরকামের কথা উল্লেখ করে থাকেন। মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিযরত পর্যন্ত এটিই ছিলো এখানকার একমাত্র মাদরাসা বা শিক্ষাকেন্দ্র। মহানবী (সা.) ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যায়েদ (রা.), হযরত খাব্বাব (রা.)-এর মত জলিলুল কদর সাহাবা (রা.)-গণ ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র।

১৬. বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষক প্রেরণ : মহানবী (সা.) কর্তৃক মক্কায় ইসলামি শিক্ষার প্রসারের এক পর্যায়ে কাফির-মুশরিকরা ইসলামি শিক্ষার মূলোৎপাটনের অভিপ্রায়ে দারুল আরকামের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। মদীনার নওমুসলিমগণ শিক্ষা লাভের জন্য হুজুর (সা.)-এর কাছে একজন শিক্ষক নিবেদন করলে নবী করীম (সা.) হযরত মাস'আব ইবনে উমায়ের (রা.)-কে শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে মদীনা প্রেরণ করেন। তিনি আস'আদ ইবনে যুররার বাড়িতে অবস্থান করে দীনি শিক্ষা দানের কাজ শুরু করেন। এটিই মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের পূর্ব পর্যন্ত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পায়। মদীনায় শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে এর চারপাশেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় মদীনা ও এর সংলগ্ন এলাকায় নয়টি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর পাশাপাশি মদীনা শহরে লেখাপড়ার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সাহাবা (রা.)-গণের বাড়িও ব্যবহার করা হতো। ইবনে মাকতুম বদরের যুদ্ধের পর হিযরত করে মদীনায় আসেন। তিনি দারুল কুরায় অবস্থান করেন। সেখানে নিজ বাড়িতে তিনি শিক্ষার কাজ আঞ্জাম দিতেন। তাঁর এই বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় আরো একটা মাদরাসা ছিলো বলে জানা যায়।

১৭. মসজিদ কেন্দ্রীক শিক্ষাদান কার্যক্রম : মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসার পরই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। মদীনায় আগমনের পর মহানবী (সা.) এখানে প্রথমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই মসজিদে নববী নামে পরিচিত। মসজিদে নববীতে প্রিয়নবী (সা.) শিক্ষার কাজ পুরোদমে শুরু করেন। বলে রাখা ভাল যে, মসজিদে নববী শুধু শিক্ষালয়ই নয় বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের সব রকমের কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মদীনাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকলে এখানে নামায ও ইবাদত-বন্দেগীর অসুবিধা হবে বিবেচনা করে মসজিদের পাশে এক কোণায় শিক্ষা দানের জন্য একটি পৃথক কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এটিই মদীনাভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম পাঠশালা যা পরে 'সুফফা' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। এক সময় মসজিদে নববী কার্যত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বড় বড় সাহাবা (রা.)-গণ ছিলেন এর শিক্ষক এবং অন্যান্য সাহাবা আজমাইন এখানকার ছাত্র হিসেবে লেখাপড়া করতেন। স্বয়ং নবী করীম (সা.) ছিলেন এর ভাইস চ্যান্সেলর। এখানে দুই ধরনের কোর্স চালু করা হয়। একটি সাময়িক এবং অপরটি নিয়মিত। নতুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর যে সকল নওমুসলিম সাহাবা (রা.) হুজুর (সা.)-এর সাথে দেখা করতে আসতেন তাঁদেরকে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান, আল্লাহ-রাসূলের পরিচয়, ঈমান-আখিরাত-রিসালাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে জ্ঞান দান করে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হতো।

১৮. শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে শিক্ষার পাঠ্যক্রম মূলত এবং প্রধানত কুরআন ও হাদীসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে পাঠ্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও এর আওতা ছিলো ব্যাপক। তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদতের নিয়ম-কানুন, যাকাতের বিধান, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, বিবাহ-তালাক ও মিরাসী আইন, চুক্তি ও সাক্ষ্য আইন, যুদ্ধ কৌশল ও নীতিগত বাধ্যবাধকতা, বিচার বিভাগীয় আইন-কানুন, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক আইন, সমাজ কল্যাণ, অর্থনীতি, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি; মোটকথা মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যে সকল জ্ঞান থাকা অপরিহার্য তার সবই এখানে শিক্ষা দান করা হতো। ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহারে হালাল-হারামের সীমারেখা, মেহমানদারী, রোগীর

পরিচর্যা, পারস্পরিক আচার-ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ও পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়নি। বিদেশী ভাষা শিক্ষা করাও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু এটা সবার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না।

১৯. বাস্তব অনুশীলনভিত্তিক পাঠদান : শিক্ষা দানের বাস্ড়ব পদ্ধতিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর পদ্ধতি। নবী করীম (সা.) যা কিছু শিক্ষা দিতেন তা নিজের জীবনে বাস্ড়বায়ন করে দেখিয়ে দিতেন। ফলে সাহাবা (রা.)-গণ তাঁকে অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। তাছাড়া অনেক সময় তিনি মুখে না বলে শুধুমাত্র হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর অনেক শিক্ষাই সাহাবা (রা.)-গণ তাঁকে দেখে লাভ করেছেন। যেমন তিনি বলতেন– "নামায পড় যেমন আমাকে পড়তে দেখ।" সাহাবা (রা.)-গণ তাঁর নামায পড়া দেখে নামাযের শিক্ষা লাভ করেছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের মুয়ামিলাত ও আচার-আচরণ থেকে সাহাবা (রা.)-গণ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।